পাঠ-পর্যালোচনাবিষয়ক সাময়িকী

প্রেক্ষা

চতুর্থ সংখ্যা

পাঠ–পর্যালোচনাবিষয়ক সাময়িকী

প্রেক্ষা

চতুর্থ সংখ্যা

সম্পাদনা

মাসুম বিল্লাহ আরিফ

সম্পাদনা সহযোগী

বোরহান উদ্দিন রব্বানী

সোহান আল মাফি

ফরহাদ হাসান

সুলতানা ইয়াসমিন

প্রচ্ছদ

সোহান আল মাফি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চের একটি প্রকাশনা

প্রকাশকাল: জুন, ২০২১

সম্পাদকীয়

পাঠাভ্যাসের তুলনা হতে পারে টাইম মেশিনে আরোহণের সাথে। কারণ পাঠের মধ্য দিয়ে আমরা অতীতে যেতে পারি অনায়াসেই। বর্তমানে বসে দর্শন করতে পারি অতীতের ঘটনা প্রবাহ। ভবিতব্য নানা ঘটনার ইঙ্গিতও পাই এই একই উপায়ে।

আবার একজন পড়ুয়া ব্যক্তি ঘরে বসেই বিশ্ব ভ্রমণ করতে পারেন। পাসপোর্ট টিকেটের ঝক্কিঝামেলা ছাড়াই সাঁতার কাটতে পারেন আমাজন নদীতে, পিরামিডের রহস্য দেখে মুগ্ধ হতে পারেন, উপভোগ করতে পারেন তাজমহলের অপার সৌন্দর্য ।

বিস্তর পাঠের মাধ্যমে দু'চোখা মানুষের তৃতীয় একটি চোখ জন্মায়। দৃশ্যমান চোখের তুলনায় এই অদৃশ্য চোখটির ক্ষমতা অত্যধিক। বই পড়ে আমাদের এতো এতো অর্জন। উপরি পাওনা হিসেবে রয়েছে আনন্দ। কারণ পাঠের প্রেষণা হিসেবে 'জ্ঞান অর্জন' ও 'আনন্দ লাভে'র আকাঙ্ক্ষাই প্রবল।

পাঠকের অর্জিত সে জ্ঞান ও আনন্দানুভূতি অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে আমরা হাজির হয়েছি ***প্রেক্ষার ৪র্থ সংখ্যা*** নিয়ে। আশাকারি আপনাদের ভালো লাগবে।

সূচীপত্র

০৪ আমরা যেভাবে এলাম *অজ্ঞাতনামা*

০৬ মশালের মতো জ্বলন্ত শরীর *দীপ্ত বিশ্বাস*

০৯ মুক্তিযুদ্ধ : তৎসময় ও এতদসময় *সুলতানা ইয়াসমিন*

১২ ছড়ার কথা *রুমান হাফিজ*

১৭ দু'জন চিরকুমার, দু'জন বীর মুক্তিযোদ্ধা *মাসুম বিল্লাহ আরিফ*

২০ অনিকেত : মানবীয় সম্পর্কের নান্দনিক রূপায়ণ *ইমতিয়াজ আহমেদ*

২৩ নিখোঁজ একটি দেশ *মাহমুদুল হাসান*

২৫ মৃত্যুর নৃত্য *নীলা*

২৭ জ্ঞানবৃদ্ধের মুখে শুনি অতীতের বয়ান *মাজহারুল ইসলাম সাইমন*

৩০ মুজিব থেকে বঙ্গবন্ধু *সুমাইয়া মোস্তারী*

আমরা যেভাবে এলাম

রিজিয়া রহমানের ***'বং থেকে বাংলা'*** বইটি নিয়ে লিখেছেন–

অজ্ঞাতনামা

উপন্যাসের ব্যাপ্তি প্রায় আড়াই হাজার বছর! বাঙালি জাতির উৎপত্তি ও বিকাশের গল্প নিয়ে লেখা। নিরেট ইতিহাস থেকে লেখা ঐতিহাসিক উপন্যাস নয় বরং ইতিহাসের সারবস্তু নিয়ে কল্পনার রঙ মাখিয়ে লেখা ইতিহাস আশ্রয়ী উপন্যাস *'বং থেকে বাংলা'*, লেখিকা রিজিয়া রহমানের অসাধারণ সৃষ্টি। বাংলা বলতে এখানে বিশেষত প্রাচীন 'বঙ্গ–সমতট' অঞ্চলকে বুঝিয়েছে। দশ অধ্যায়ে বিভক্ত উপন্যাসের প্রতিটি অধ্যায় বাঙালি জাতির বিবর্তনের এক একটি ধাপ। প্রতি অধ্যায়ে নতুন নতুন চরিত্র দিয়ে সেই সময়ের জীবনাচরণ তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন লেখিকা। এক অধ্যায়ের সাথে অন্যটির মেলবন্ধন তৈরি করেছে সময়। তাই সময়ই এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র।

অনেক অনেক বছর আগের কথা। আর্যদের কাছে পরাজিত হয়ে জাহাজে করে পলায়নপর একদল দ্রাবিড় সমুদ্র দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে একজোড়া যুবক যুবতীকে ফেলে দেয় সমুদ্রে। ভাগ্য দেবতা তাদের ভাসিয়ে নিয়ে আসে সমতট অঞ্চলে। বং নামের যুবা পুরুষের হাত ধরে এলা নামের তরুণীটি পা রাখে সমতটের মাটিতে। তুলনামূলক সভ্য জগতের মানুষ দুটি এখানে খোঁজ পায় খানিকটা বন্য স্বভাবের কিছু নর নারীর। এরাই সমতটের আদি বাসিন্দা। এদের সাথে ভাব হয় আগুন্তুকদের। শুরু হয় বং বা বঙ্গ জাতির ইতিহাসের গল্প।

এরপর ক্রমান্বয়ে এসেছে বাঙালি জাতির ক্রমবিকাশের ইতিহাস। দ্বিতীয় পর্বে দেখা গেছে সমতটে স্থলচর কৃষিজীবী মানুষ। পরের পর্বে এসেছে গোত্র প্রতিষ্ঠার প্রথা। এরপর মৌর্য, গুপ্ত, সেন, তুর্কি, মোঘল, ইংরেজ, পাকিস্তান শাসনামলে বাংলার সাধারণ মানুষের জীবনের কথকতা। বিভিন্ন জাতির শাসকদের দ্বারা শাসিত–শোষিত হয়েছে বাংলার মানুষ। শাসকের হাতে ধর্ম হয়েছে শোষণের হাতিয়ার। বাংলার সাধারণ মানুষের কথা কেউ ভাবেনি। সবার চোখ ছিল সুফলা বাংলার সম্পদে। ১৯৭১ সালের সদ্য স্বাধীন বাংলায় এসে শেষ হয়েছে উপন্যাস।

দশ পর্বে বিভক্ত উপন্যাসের প্রতিটি পর্বই আলাদা একটা উপন্যাস হয়ে উঠতে পারার যোগ্যতা রাখে। যুগের চাহিদা অনুযায়ী আদিমকাল থেকে বর্তমান সময়ের আদলে চরিত্রগুলো বিন্যাস করা হয়েছে।

শাসনকার্যে, ব্যবসা করতে, লুণ্ঠন করতে, ধর্ম প্রচারে বিভিন্ন জাতির মানুষ এসেছে বাংলায়। বাংলার প্রেমেই হোক বা বাঙালি নারীর প্রেমেই হোক থেকে গেছে এখানে। বাঙালির রক্তে তাদের রক্ত মিশে বাঙালির শারীরিক গঠনে এসেছে পরিবর্তন। পরিবর্তন এসেছে ভাষায়, এসেছে সংস্কৃতিতে। যুগে যুগে এইসব রূপান্তর মেনে নিয়েই আজকের বাঙালি জাতি। উপমহাদেশে সবার সাথে থেকেও বাঙালি তার নিজস্ব জাতিসত্ত্বাকে আলাদা রেখেছে সবসময়ই। প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে একটা স্বাধীন জাতি হিসেবে।

*'বং থেকে বাংলা'*য় ইতিহাসকে চাপিয়ে দেয়া হয়নি। বরং উপন্যাসের চরিত্ররা ইতিহাসকে ধারণ করে প্রাণবন্ত করেছে বর্ণনাকে। ইতিহাসে শাসকের জীবনীতে সাধারণ মানুষকে দেখতে হয়, উপন্যাসে সাধারণ মানুষের জীবনের অনুষঙ্গ হিসেবে এসেছে শাসকের কথা। ইতিহাস সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের সাথে লেখিকার কল্পনা শক্তি বাঙ্ময় করে তুলেছে গল্প। যুগে যুগে জীবনাচার, পোশাক, ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, সবকিছুতেই ভিন্নতা এসেছে। শুধু অপরিবর্তিত থেকে গেছে মানুষের হৃদয়াবেগ... ভালোবাসায়, ঘৃণায়। আদিম 'বং–এলা' থেকে 'মিন্টু–রমিজা'র মধ্যে মানবিক পার্থক্য তাই খুব বেশি নয়। হাজার হাজার বছর সময়ের ক্যানভাসে লেখা উপন্যাসটি মুগ্ধ করবে পাঠককে।

পুনশ্চ: উপন্যাসটিকে মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস বলা হয়ে থাকে, লেখিকাও মুখবন্ধে তাই বলেছেন। কিন্তু এটা শুধু একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস নয়। হাজার বছর ধরে বাঙালি জাতির প্রতিষ্ঠা পাবার লড়াই, যা কিনা শেষ হয়েছে ১৯৭১ এসে।

মশালের মতো জ্বলন্ত শরীর

সৈয়দ শামসুল হকের উপন্যাস ***'নিষিদ্ধ লোবান'*** নিয়ে লিখেছেন–

দীপ্ত বিশ্বাস

'লোবান' শব্দের অর্থ সেই উৎকৃষ্ট বৃক্ষনির্যাস যার বিশুদ্ধতা পবিত্র আবেশে সবকিছুকে লীন করে রাখে।

২৫শে মার্চের কালো রাতের পর আলতাফের কোন খোঁজ পাওয়া যায় না। বিলকিস বহু অপেক্ষার পর পৈতৃক ভিটা জলেশ্বরীর পথে রওনা হয়। বিলকিস জানে আলতাফ আর ফিরে আসবে না। ট্রেন তাকে নামিয়ে দেয় জলেশ্বরীর আগের স্টেশন নবগ্রামে। সামনে ৫ মাইল পথ। পথে সঙ্গী হয় সিরাজ কিংবা সবকিছু হারানো শ্রী প্রদীপ কুমার বিশ্বাস। জলেশ্বরীর শূন্য ভিটেয় তখন কারো চিহ্ন নেই। বিলকিসের মনে পড়ে ভাই খোকার কথা। ক'দিন আগেই হারমোনিয়াম কেনার টাকা চেয়ে চিঠি লেখা খোকা আর সিরাজ যেন একাকার হয়ে গেছে। সত্যিই, 'কখনো কখনো সমস্ত মানুষের মুখ এক হয়ে যায়।' নিস্তব্ধ জনপদে এককালের জাঁদরেল আলেফ মোক্তার একা বসে। পরিবার পরিজনহীন অন্ধ মোক্তার কার্যত বিহারি ছেলেদের জীবন্ত খেলার পুতুল মাত্র।

খোকার মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়। বাজারে আরও অনেক লোকের সাথে রক্তের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে খোকার লাশ।

'নিষিদ্ধ লোবান' এর জলেশ্বরী যেন এক টুকরো যুদ্ধক্ষেত্র, আর বিলকিস সেখানকার জননী সাহসিকা। তাই হয়তো দাফন না হওয়া লাশের মিছিল তার মনকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ধরা পড়ার পর কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে যখন নারীলিপ্সু পাকিস্তানি মেজরকে আমরা বলতে শুনি, *"আমি তোমায় সন্তান দিতে পারবো, উত্তম বীজ উত্তম ফসল। তোমার সন্তান খাঁটি মুসলমান হবে। আমরা সেই সন্তান তোমাদের দেব, তোমাকে দেব, তোমার বোনকে দেব, তোমার মাকে দেব, যারা হিন্দু নয়, অবাধ্য নয়, আন্দোলন করে না, জাতির এই খেদমত আমরা করতে এসেছি"*। পাঠকের হাতের মুষ্টি পাকিয়ে আসে। এই চরম জাত্যাভিমানী সংলাপে মাথায় আগুন ধরে যায়। তীব্র ক্রোধে সমস্ত সত্তা যেন বিদ্রোহ করে বসে।

লেখক হিসেবে সৈয়দ শামসুল হকের এর বেশি আর কী চাওয়া থাকতে পারতো? বই পড়তে পড়তে

পাঠক নিজেকে প্রদীপ হিসেবে ভাবতে শুরু করছে, যার লাশ আধকোশার তীরে দাহ হওয়ার জন্য চিতায় পড়ে আছে। কিংবা সেই অন্ধ মোক্তার, যার অপমানিত হবার বর্ণনা পাঠকের মনকে নিদারুণ কষ্টে গ্রাস করে। একজন ঔপন্যাসিকের সার্থকতা আসলে তখনই যখন পাঠক নিজেকে গল্পের একজন চরিত্র হিসেবে কল্পনা করতে শুরু করে।

ছোট্ট একটি উপন্যাস যে এতটা জীবন্ত হতে পারে সেটা সৈয়দ হকের *'নিষিদ্ধ লোবান'* না পড়লে বোঝা মুশকিল। দারুণ সাবলীল বর্ণনা আর চরিত্রগুলোর স্বতন্ত্র আবেগ প্রকাশের ধরণ ভীষণ রকম লক্ষ্যনীয়। সাধারণ একটা গল্পকে বিরাট একটি ক্যানভাসে ছড়িয়ে দেওয়ার যে অসাধারণত্ব সৈয়দ শামসুল হক দেখিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। এটি সেই মাস্টারপিস যাকে এক ঝলক দেখেই বলে দেওয়া যায়, এর পেছনে রয়েছে শিল্পীর বহু বিনিদ্র রাতের গল্প।

- উপন্যাসের জলেশ্বরী রংপুর অঞ্চলে হলেও সে অঞ্চলের ভাষার ব্যবহার পাওয়া যায় না। লেখকের কাব্যগ্রন্থ *'পরাণের গহীন ভেতর'* পড়ে লোকভাষার যে মাধুর্য মনকে তৃপ্তি দেয় সে তৃপ্তি তাই খুঁজে পাওয়া ভার। তার ওপর পাকিস্তানি মেজর যখন খাস বাংলায় সংলাপ ঝাড়েন, পাঠক মনে একটু হলেও 'কিন্তু'র সৃষ্টি হয়। যেন কাদায় খেলতে গিয়ে কাদায় পা না ছোঁয়ানো!

- বিরাম চিহ্নের ব্যবহার একটু অদ্ভুতুড়ে ঠেকেছে। কমার যথেচ্ছ ব্যবহার চোখে পড়ে। যেমন, *"বিলকিস আস্তে আস্তে বাইরে আসে। এসে, আলেফ মোক্তারের কাছে দাঁড়ায়।"* লেখকেরা অনেক ক্ষেত্রেই লেখা নিয়ে নিরীক্ষা করেই। তবে এটি যদি নিরীক্ষা হয়ে থাকে, তবে বলব, এ নিরীক্ষা কেমন যেন বাধো বাধো।

- সিরাজের সত্যিকার পরিচয় সম্পর্কে পাঠক বেশ আগেই ধারণা করে নিতে পেরেছে বলে মনে করি। তাই পুনরায় পরিচয় সংক্রান্ত আলাপ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি না এলেও পারতো।

- কল্পনাপ্রসূত লেগেছে বেশ কিছু জায়গায়। তবে একে অতিরঞ্জন বলব না। লেখকের সে স্বাধীনতা সবসময়ই থাকে। গল্পের গোরু তাই গাছে চড়তেই পারে।

- সংলাপ নির্ভরতা বড্ড বেশিই। কোন কোন সংলাপের ক্ষেত্রে 'নীরবতা'র মতো শব্দের ব্যবহার অনেকটা কাব্যনাট্যের স্বাদ উপহার দিয়েছে। বলা বাহুল্য, এ স্বাদ বড় বেশি অনভিপ্রেত। আমার ধারণা এসব কারণে উপন্যাস তার স্বাভাবিক গতি হারিয়েছে।

'লোবান' শব্দের অর্থ দিয়ে শুরু করেছিলাম। উপন্যাস শেষ হবার পর সত্যিই মনে হয়েছে, বিলকিস সেই নিষিদ্ধ লোবান যার *'মশালের মতো জ্বলন্ত শরীর'* এর পবিত্রতা জাত্যাভিমান আর স্বাধীনতার শবে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। লোবানের সুঘ্রান যেন শবের দম আটকানো গন্ধকে এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছে।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ এমন কত বিলকিসের আগুন পাখি হবার, কত প্রদীপের আলোকময় আত্মা বুকে বয়ে বেড়াচ্ছে, তার সবটা হয়তো আমাদের জানা হয় না। নিষিদ্ধ লোবান আমাদের মাথা নত না করার যে গল্প শোনায়, আমরা পরম মমতায় শুনে যাই। হৃদয়ের কাছাকাছি থাকা এ দৃশ্যপট তাই বড্ড বেশি আমার গল্প, আমাদের গল্প। এ গল্প বড্ড বেশি মানবিক বোধের গল্প।

মুক্তিযুদ্ধ : তৎসময় ও এতদসময়

শহীদুল জহিরের উপন্যাস ***'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা'*** নিয়ে লিখেছেন–

সুলতানা ইয়াসমিন

শহীদুল জহিরের *'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা'* মুক্তিযুদ্ধের আশ্রয়ে রচিত, অত্যন্ত ক্ষুদ্র কলেবরের এক বিশাল উপন্যাস। এটিকে রূপকধর্মী উপন্যাস বললে বোধহয় অত্যুক্তি হয় না। মুক্তিযুদ্ধের আশ্রয়ে রচিত হলেও, এতে কোনো সাহসী বীরযোদ্ধার গল্প নেই। নেই কোনো রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের বীভৎস বর্ণনা। এতে আছে মুক্তিযুদ্ধের আলোকে বর্তমান বিশ্লেষণ এবং এক বিশাল মনস্তাত্ত্বিক উপাখ্যান। যেন মনে হয় লেখকের পঠিত কোনো গল্পের বিবরণ এটি, যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর নিজস্ব কিছু পর্যবেক্ষণ, মতামত, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। শহীদুল জহিরের চিরাচরিত বাক্যগঠনশৈলী পাঠককে অদ্ভুত মোহঘোরে আবিষ্ট করে রাখে। এক দুর্দান্ত রকমের তীক্ষ্ণতা আর পরিমিতিবোধ দ্বারা জড়ানো, ঝাঁঝালো অনুভূতির চাদরে জড়িয়ে থাকেন পাঠক।

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র আব্দুল মজিদ। ১৯৮৫ সালে একদিন হরতাল পালনে জনগণকে ধন্যবাদ জানাতে থাকা মাইকিংয়ের কারণে, আব্দুল মজিদের স্যান্ডেলের ফিতে ছিঁড়ে যায়। কিন্তু কেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে ঘটনার মর্মমূলে পৌঁছতে হবে পাঠককে।

উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই, যুবক আব্দুল মজিদের স্যান্ডেল ছেঁড়ার ঘটনা, কিশোর আব্দুল মজিদের অসহায়ত্ব, মোমেনা আপার পরিণতি, বদু মওলানার কাকেদের মাংস খাওয়ানো, পাকিস্তানী মিলিটারির সঙ্গে বদু মওলানার সম্পর্ক, কিশোর আলাউদ্দিনের মৃত্যু এবং আজিজ পাঠানরা বার বার ঘুরে ফিরে আসে। ধীরে ধীরে একটি নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে ক্রমশ অগ্রসর হতে থাকে, যার গন্ধ বইয়ের

প্রথম লাইন থেকেই পেয়ে যাবেন পাঠক। সেই গন্ধে সম্মোহিত হয়ে পাঠক যখন শহীদুল জহির রচিত পথে হাঁটতে থাকেন, একাত্তর থেকে পঁচাশি, পঁচাশি থেকে একাত্তর মিলেমিশে যেতে থাকে পাঠকের চিত্তে। একাত্তর থেকে পঁচাশিকে আলাদা করে দেখতে হলে, পাঠককে থাকতে হবে সদা সাবধানী। ইতিহাসের গলিঘুঁজিকে, অদ্ভুত নৈপুণ্যতা দিয়ে, লক্ষ্মীবাজার শ্যামাপ্রসাদ লেনের এক গল্পের ভেতর পুরে দিয়েছেন শহীদুল জহির। অথচ তাতে করে ইতিহাসের বাদ্যযন্ত্র তার গুরুত্ব অক্ষুণ্ন রেখেই পেয়েছে আরো বিশাল ব্যাপ্তি।

এ উপন্যাস এক পরাজয়ের আখ্যান। এটি পাঠককে দিয়ে যায় এক গভীর জিজ্ঞাসা -'মুক্তিযুদ্ধ কতটুকু মুক্তি দিয়েছে আমাদের?'- ১৯৭১ সালে বদু মওলানা, আকাশে মাংস ছুঁড়ে ছুঁড়ে যে কাকেদের সঙ্গে সখ্য গড়েছিল, ১৯৮৫ সালে তারই পুত্র খয়ের মওলানার জোব্বার ভেতর থেকে দলে দলে বেরিয়ে আসে সেই কাকেরা।

"একমাত্র মুরগীর ভয় থাকে বলাৎকারের শিকার হওয়ার আর ছিল গুহাচারী আদিম মানবীর। কিন্তু পাকিস্তানী মিলিটারি এক ঘণ্টায় পঞ্চাশ হাজার বছর ধরে মানুষের বুনে তোলা সভ্যতার চাদর ছিঁড়ে ফেলে... মা এবং ছেলে, পিতা এবং যুবতীকন্যা একসঙ্গে বলাৎকারের অর্থ অনুধাবন করে।"

আজকের স্বাধীন দেশে কোনো বিজাতীয় শত্রুর ভয় নেই। বরং উপন্যাসের প্রথম লাইনে যে কারণে আব্দুল মজিদের স্যান্ডেলের ফিতে ছিঁড়ে যায়, একই কারণে, দেশীয় মানুষজনের ভয়ে, বিগত কয়েক দশক ধরেই, পাড়া-মহল্লা কিংবা দেশ ছাড়ছে অসংখ্য মানুষ।

মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা ছিল অত্যাচারী-নিপীড়কদের দোসর, স্বাধীনদেশে তারাই হয়ে উঠে জনগণের সেবক! ইতিহাসের গোলকধাঁধা জুড়ে, নিরন্তর চলতে থাকা এই ইঁদুর-বিড়াল খেলার, এক দারুণ উপস্থাপন বলা যায় এই উপন্যাসের বদু মওলানাকে। যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরির আগে এই বদু মওলানা ছিল এক ক্ষুধার্ত বিড়াল, যে নিজের ক্ষুধা মেটানোর জন্য যুদ্ধ চেয়েছিল। যুদ্ধের প্রাককালে সে হয়ে উঠে পালিয়ে বেড়ানো এক ইঁদুর, যে বুঝতে পারে যে সে কেবল যুদ্ধ চেয়েছিল অথচ কাঙ্ক্ষিত সেই যুদ্ধের

মুখোমুখি হওয়ার হিম্মত তার নেই। যুদ্ধ চলাকালীন সময় সে আবার হয়ে উঠে এক শিকারি বিড়াল। যুদ্ধের শেষদিকে আবার হয়ে পড়ে এক জান বাঁচানোর নিমিত্তে গর্তে ঢুকে পড়া ইঁদুর। যুদ্ধের পর যখন সবাই সব ভুলে যাওয়ার ভান করছে, ঠিক তখন আবার সে হয়ে উঠে এক পরিপূর্ণ বিড়াল। তার ছানাপোনারা জনগণকে ডাকে 'ভাইসব', মাইকিং করে জানাতে থাকে 'ধন্যবাদ'।

১৯৭১ সালের যে মুক্তিযুদ্ধ, তা ১৯৭১ হতে ১৯৮৫ হয়ে, আজ অবধি আমাদের সেই একই -*"জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা"*- হতে মুক্তি দিতে পারেনি। আজো আমরা হেঁটে চলেছি একই দিকে। যার পথে পথে পড়ে রয়েছে অসংখ্য কঙ্কাল-করোটির ধ্বংসস্তূপ। সেই ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে আছে আমাদের নড়বড়ে উজ্জ্বল স্বাধীনতা। আর সেই স্বাধীনতার জয়স্তম্ভের ফাটলে প্রতিনিয়ত গজিয়ে উঠছে অসংখ্য অশ্বত্থ গাছ। বদু মওলানারা মরে না কোনো কালেই।

ছড়ার কথা

কামরুল আলমের ছড়াগ্রন্থ ***'কিচিরমিচির'*** নিয়ে লিখেছেন–

রুমান হাফিজ

কামরুল আলম। সময়ের জনপ্রিয় একজন ছড়াকার। বাংলা ছড়ার সুর-ছন্দ তাঁর রচনায় আলোর ফুল হয়ে ফুটে ওঠে। কামরুল আলম দীর্ঘদিন ধরে ছড়া সম্পর্কিত নানা কাজের সঙ্গে জড়িত আছেন। *'ছড়াকণ্ঠ'* নামে একটা ছড়াপত্রিকাও সম্পাদনা করেছেন। এছাড়াও তিনি সম্পাদনা করেছেন ছোটদের ছোটকাগজ *'কচি'*, শিল্পসাহিত্যের ত্রৈমাসিক পত্রিকা *'ধ্রুবতারা'*। শুধু কি ছড়াই লেখেন? – না।

কামরুল আলমের কলম সাহিত্যের সকল শাখাতে সমান তালে প্রশংসা কুড়াতে সক্ষম। প্রতিভাবান এই ছড়াশিল্পীর প্রথম ছড়ার বই 'কিচিরমিচির' যা একটি শিশুতোষ ছড়াগ্রন্থ। মিষ্টি ছড়ার গাঁথুনিতে ছন্দসুরে, শিশুদের জগত নিয়ে কামরুল আলম খুব স্বাচ্ছন্দ্যে নদীর ঢেউয়ের মতো ছড়া লেখেন। ছড়া দিয়েই তাঁর হাতেখড়ি হলেও কবে যে পত্রপুষ্পে শোভিত বৃক্ষে পরিণত হয়েছেন তা টের পাওয়া যায়নি।

'কিচিরমিচির' পড়তে গিয়ে অনেক ধরনের প্রশ্ন–উত্তর মনে উদিত হয়েছে। মায়ের মুখের বুলির মতো মায়ের মুখের ভাষায় ছড়া কেউ লিখেনি? *'কিচিরমিচির'*–এ সেই প্রকৃত ছড়ার সন্ধান পেয়ে বেশ আনন্দবোধ করছি।

কামরুল আলম যে সময়ের জনপ্রিয় ছড়াকার হয়ে উঠেছেন তাঁর ছড়াগ্রন্থ *'কিচিরমিচির'* থেকে দু–চার লাইন উদাহরণ দিলেই এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে।

'মা' ছোট্ট একটি শব্দ। পৃথিবীতে এই শব্দটি নিয়ে ছড়া কিংবা কবিতা লেখেননি এমন লেখক হয়তো খুঁজে পাওয়া মুশকিল। কামরুল আলমের 'মা' ছড়ায় ছেলের প্রতি মায়ের ভালোবাসার এক বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে,

'আমি কভু দূরে গেলে

শান্তি মনে পায় না মা যে,

এই জীবনে আমার কোনো

বিপদ আপদ চায় না মা যে

রোজই দেখি চোখের পানি

ফেলছে বসে জায়নামাজে।'

ভালো ছেলের বৈশিষ্ট্য কী? ছড়াকারের ভাষায়,

'পাঠ্য বইয়ে মনোযোগী

স্কুলে যায় ঠিক সময়

রাস্তা দিয়ে সোজা হাঁটে

অন্য কোনো দিক তো নয়।'

দেশের জন্য ভালোবাসা কার না আছে। ছড়াশিল্পী কামরুল আলমের মনটা দেশের মাটির বুকেই গেঁথে রেখেছেন,

'আমার দেশের মাটির বুকে

মনটা আমার গাঁথা

দেশকে নিয়ে সকল সময়

ঘামাই শুধু মাথা।

দেশকে নিয়ে লিখবো ছড়া

গল্প, গান আর নাটক

দেশের কাছে রইবে আমার

এই প্রতিভা আটক।'

পড়াশোনায় মন দিতে কারই বা ভালো লাগে? কিন্তু সারাক্ষণ আব্বু, আম্মু, ভাইয়া–আপুসহ বড়রা কেবল পড়ার জন্য চাপ দেন। অথচ ছোট্ট সোনামণিদের মন তখন ঘুরে বেড়ায় কত যে দূর অজানায়,

'কান ধরে কন আব্বু যখন

মন লাগাতে বই পাঠে

আমার তখন ইচ্ছে করে

খেলায় যেতে ওই মাঠে।

মন থাকে না কক্ষনো যে

ছোট্ট বইয়ের গণ্ডিতে

মনের সাথে কোথায় ঘুরি

খোঁজ রাখে না পণ্ডিতে।

পথকলি আমাদের সমাজে অবহেলিত একটি সম্প্রদায়। আপনার আমার একটুখানি সহায়তায় এরাও বড় হয়ে হতে পারতো অনেক কিছু,

'পথের ধারের এই ছেলেটি

পারতো হতে নেতা

বুঝতো তখন সেই আমাদের

দুঃখ এবং ব্যথা।

হয়তো হতো বিচারপতি

করতো বিচার ভালো

নয়তো হতো বুদ্ধিজীবী

জ্বালতো দেশে আলো।'

মানুষ তো সবাই সমান। তবু কেন এত অমিল?

'তোমার চোখে হয়তো আমি

ছোট লোকের বাচ্চা

তাই আমাকে যখন তখন

বকতে পারো, আচ্ছা।

শরীর কেটে রক্ত দেখো

তোমার মতোই লাল হবে

তোমার বাসায় কাজ করেও

খাই কেন রোজ গাল তবে?

বইয়ের প্রথম ছড়ায় সৃষ্টির গুণগান গেয়ে স্রষ্টার পরিচিতি তুলে ধরেছেন এভাবে,

'এই যে পাখি ভোরবেলাতে

কিচিরমিচির গান করে

কিংবা পাহাড় দাঁড়িয়ে থাকে

বুকটাকে টান টান করে।

চলছে নদী নিরবধি

সৃষ্টিরা সব জ্বলন্ত

আল্লাহতায়ালার দয়ায় সারা

বিশ্বজাহান চলন্ত।

এরকম নানা রঙে-ঢঙে দেশের প্রকৃতি, শিশুমনের ভাবনা ছড়ায় ছড়ায় মূর্ত হয়ে উঠেছে *'কিচিরমিচির'*–এর পাতায় পাতায়। কামরুল আলম একজন নিষ্ঠাবান লেখক। ছড়াকে তিনি ভালোবাসেন, তাই তিনি ছড়া নির্মাণ করেন ভালোবাসা দিয়ে।

তিনি ছড়াকে ছন্দ, পাঠবিন্যাসে আন্তরিক ও নতুন সজ্জায় সাজিয়ে তুলতে চান। নিখুঁত মিল ও ব্যাকরণসম্মত, বিষয়ে ভিন্নতা, শিশু, মা-মাটি, দেশ, প্রকৃতি ও সমকালীন বিষয় নিয়ে তিনি ছড়া লিখেন। যার প্রমাণ মেলে দৈনিক পত্রিকা কিংবা লিটলম্যাগগুলোতে তাঁর সরব উপস্থিতি দেখে। সবচেয়ে বড়কথা, কামরুল আলমের ছড়া হৃদয়গ্রাহী। মনকে স্পর্শ করে। যখন ছড়ার মোড়কে অসংখ্য আজেবাজে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছড়া রচিত হচ্ছে তখন কামরুল আলমের সৎ উচ্চকণ্ঠ আমাদের আশাবাদকে দৃঢ় করে। তাই তো তিনি বলেছেন,

'ছড়া দিয়ে গড়া যায় উৎসব

দূর করে সমাজের খুঁত সব।'

বাংলা ছড়া কখনো মরে না, নষ্ট হবে না। আর এ প্রতিভাবান কামরুল আলমকেই দায়িত্ব নিতে হবে খাঁটি ছড়া নির্মাণের জন্য। আমি প্রতিভাবান এই লেখকের উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করছি।

দু'জন চিরকুমার, দু'জন বীর মুক্তিযোদ্ধা

আহমদ ছফার বিখ্যাত বই ***'বাঙালি মুসলমানের মন'*** নিয়ে লিখেছেন–

মাসুম বিল্লাহ আরিফ

ছফার উপন্যাস চিত্তে প্রবল সুখানুভূতির আমেজ ছড়ালেও, প্রবন্ধসমূহ সর্বাংশে সেরূপ নয়। প্রবন্ধ একটু মেদহীন, কষ–বিবর্জিত হবে এটাই স্বাভাবিক, তবে ছফা সাহেবের বহু প্রবন্ধ পড়তে গিয়ে আমি বিষম খেয়েছি। গরল পানের স্বাদ কেমন জানি না, তবে গরলের তুলনাই দিতে চাই এই পাঠের।

এই রুচি সংকটের কারণ হয়তো পাঠক হিসেবে আমার বুদ্ধিবৃত্তিক দীনতা, প্রবন্ধের কনটেক্সটের সাথে পরিচয়হীনতা। সাথে নিশ্চিতভাবেই ভাষার কঠিনতা।

সমাজের এভারেজ পড়ুয়া শ্রেণির নিকট আহমদ ছফার যে দু'চারখানা বই অতি পরিচিতি লাভ করেছে তার মধ্যে *'বাঙালি মুসলমানের মন'* একটি। পড়ুক না পড়ুক, লোকে বইটির নাম জানে, এটাও কম কিসে।

নাম প্রবন্ধটিই এই বইখানার সুনাম–খ্যাতির প্রধান কারণ। উত্তর ভূমিকায় লেখক এই প্রবন্ধটি লেখার 'পেছনের গল্পটি' সুন্দরভাবে বয়ান করেছেন। এছাড়াও বইয়ের প্রায় প্রতিটি প্রবন্ধের প্রারম্ভ সুর তিনি 'উত্তর ভূমিকা'য় বুনে গিয়েছেন।

'বাঙালি মুসলমানের মন' প্রবন্ধটির পেছনে যেহেতু একজন নাস্তিকের সিরাত মাহফিলে যাওয়ার ঘটনা, সেহেতু এই প্রবন্ধে বাঙালি মননের ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াই প্রাধান্য পেয়েছে। তাই এই প্রবন্ধকে বাঙালি মুসলমান মননের আংশিক বিশ্লেষণই বলা যায়।

আমাদের বোদ্ধাসমাজ ধর্মনিয়ে আলোচনা শুরু করা মাত্রই তাদের এ সংক্রান্ত জ্ঞানের গরীবী হালত ফুটে ওঠে। ইসলাম নিয়ে আরজ আলী সাহেবের বক্তব্য যার অতিউত্তম উদাহরণ। তবে আহমদ ছফা এক্ষেত্রে তার জানাশোনার প্রমাণ দিয়েছেন। তিনি মরু পথে ব্রাহ্মণের আমদানীকারক পুঁথি লেখকদের চিন্তাকে ইসলাম ধর্মের মূল দর্শন হিসেবে খারিজ করে দিয়ে বলেন, *"এর কারণ পুঁথি লেখকদের ভাষাজ্ঞান ও ধর্মীয় জ্ঞানের স্বল্পতা ও চিন্তার দৈন্যতা।"* এটাও এমনি এমনি হয়নি। জাতপাতে আবদ্ধ তথাকথিত কুলিন হিন্দুদের নিম্নশ্রেণি নিপীড়নের প্রতিক্রিয়াই এ দীনতার কারণ।

সর্বসাকুল্যে লেখক তার কাঙ্ক্ষিত পয়েন্টে খুব সূক্ষ্ম ও বলিষ্ঠ আলোচনা করে বরাবরের মতোই নিজ মুনশিয়ানার চমক দেখিয়েছেন।

লেখক ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান সেক্যুলার মানুষ (আজকালের গলা ফাটানো ধান্ধাবাজ সেক্যুলার না)। তাই মানিক বন্দোপাধ্যায়ের 'হোসেন মিয়া' চরিত্রটি তার আরাধ্য চরিত্র হবে, এটাই স্বাভাবিক। ধর্মহীন ময়নাদ্বীপের আপাত সাম্যের সমাজকে লেখক যুক্তির নিগড়ে আদর্শ বস্তুবাদী সমাজের প্রতিভূ হিসেবে তুলে ধরেছেন। শিক্ষার দর্শনেও তার খাঁটি সেক্যুলার মনোবৃত্তির ছাপ রয়েছে; যার উদ্ভব ইউরোপে রেনেসাঁ ও আলোকায়নের যুগে।

এরপর *'রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতি-সাধনা'*, *'বার্ট্রান্ড রাসেল'* ও *'ভবিষ্যতের ভাবনা'* টানা তিনটি প্রবন্ধই আমার বোধ–বহির্ভূত ঠেকেছে। ভাষাগুলো কেমন জটিল, দীর্ঘ ও ঠনঠনে। বোধ–বহির্ভূত হওয়ার অন্য কারণগুলোও এই পাঠ পর্যালোচনার প্রারম্ভে উল্লেখ করেছি।

আমাদের দেশজ ইতিহাস ও রাজনৈতিক বাংলাদেশ ভূখণ্ড উন্মেষের ক্রমধারা বয়ানে আজও যে অস্বচ্ছতা আর একপেশে লেখনির জঞ্জাল দৃশ্যমান তার কিঞ্চিত কারণ আলোচিত হয়েছে *'বাংলাদেশের ইতিহাস প্রসঙ্গে'* ও *'একুশে ফেব্রুয়ারি উনিশ শ বাহাত্তর'* প্রবন্ধ দুটিতে। লেখক আমাদের ভাষা আন্দোলনকে সামগ্রিকভাবে একটি রেনেসাঁর মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। যা নিঃসন্দেহে অতি উত্তম উপলব্ধি।

চিত্রকলা নিয়ে ফ্রান্স ও ইতালিসহ ইউরোপের দেশগুলোর মাতামাতির অন্ত নেই। থাকবে নাও বা কেন, তাদের রেনেসাঁর বিশাল অংশজুড়ে এই চিত্রকলা বিরাজমান। আমরা বাঙালিরা চিত্রকলার একটি পট–ই চিনি, তাও বিদেশি পট। মোনালিসা। আর চিত্রশিল্পী বলতেও সেই একজনের নামই জানি, জয়নুল আবেদীন। আরেকটু অগ্রগামী যারা তারা একালের আরও কতিপয়কে চিনে ও জানে।

ইংরেজ কলোনির নিগড় হতে দেশজ শিল্পকলার যে যাত্রা, ছফা সাহেব তার প্রবন্ধে অবনঠাকুর–নন্দলাল–যামিনী রায় এই তিন বিন্যাসে তার ক্রমাগত উৎকর্ষের কথা বয়ান করেছেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, এ তিন মহারথির সবাই বাঙালি হলেও কলকাতা কেন্দ্রের। ঢাকা কেন্দ্রের যে বাঙালি সমাজ তার সাথে কলকাতা কেন্দ্রের বিস্তর ফারাক রয়েছে। সেটা চিত্রে গানে সাহিত্যে, সবখানেই দৃশ্যমান। তবে ঢাকাইয়া চিত্রশিল্পের আদি পুরোহিতদের শিল্পজীবনের হাতে খড়ি কিন্তু তৎকালীন বঙ্গভূমের একক শহর কোলকাতাতেই।

এরপর এলেন শিল্পচার্য জয়নুল আবেদীন। বাঙালি মুসলমানের প্রথম চিত্রশিল্পী, তবে ইসলামী নয়। অনেকেই মুসলিম শিল্পী আর ইসলামী শিল্পীতে গুলিয়ে মূল্যায়ণ বিভ্রাট ঘটায়।

জয়নুল নৃতাত্ত্বিকভাবে মুসলিম সমাজের হয়েও ঢাকাইয়া বাঙালি জনগোষ্ঠীর চিত্রশিল্পের প্রতিনিধি হয়ে উঠলেন, হলেন এদের আঁকিয়ে গুরু। সাধারণ কাগজ আর কাঠ-কয়লার নিপুণ মিলনে সৃষ্ট কাকের প্রতি তাই সবার এতো আগ্রহ। মজার ব্যাপার হলো এই কাকটি কিন্তু ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় কলকাতার রাস্তায় বসে আঁকা। সে অঙ্কন দৃশ্যটি হুমায়ুন আহমেদ তার *'মধ্যাহ্ন'* বইয়ে দারুণভাবে জীবন্ত করে তুলেছেন।

এস এম সুলতান (শেখ মুহাম্মদ সুলতান) এর জীবনালেখ্য পাঠে এক বিস্ময়বিহ্বলতা ঘিরে ধরেছে পাঠক আমাকে। কী ড্রামাটিক জীবন! কী বোহেমিয়ান লাইফ স্টাইল!!

তার জীবন–প্রকৃতি ছফার একটি বাক্য কী সার্থকরূপে ধারণ করেছে - *"তার জীবনের যেন কোন সূচনা নেই, শৈশব নেই, কৈশোর নেই, হঠাৎ করে বাংলাদেশের ইতিহাসের ভেতর থেকে একরাশ কাঁচাপাকা বাবরি চুল দুলিয়ে জেগে উঠেছেন।"*

লাল মিয়ার এস এম সুলতান হয়ে ওঠার পেছনে শিক্ষা আর শিল্পপ্রেমী দু'চারজন মানবের উপস্থিতি শুদ্ধ মানবিকতাবোধের গান গাইছে।

আরেকটা কথা, লাহোর-করাচী সুলতানের কর্মের যতটুকু সমঝদার ছিলে ঢাকা ততটুকু নয়। বিলেত আর আমেরিকা তাকে যতখানি বুঝতে পেরেছে মাতৃভূমির মানুষ ততটা না।

এস এম সুলতানের জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি – আমার দৃষ্টিতে – আহমদ ছফার মতো এতো শক্তিমান একজন বুদ্ধিজীবী গুণগ্রাহী পাওয়া। *'যদ্যপি আমার গুরু'* বইয়েই দেখেছি, সুলতানের প্রতি লেখকের কী অসীম মমতা, তার কর্মের প্রতি ছফার কী অপূর্ব টান। সুলতানের চিত্র-সন্তানগুলো সবার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে তিনি কতই না প্রাণান্তকর চেষ্টা করেছেন.. চিত্রকলা নিয়ে মুখবুজে পড়াশোনা করেছেন, নানা জনের দ্বারে গিয়ে তার মার্কেটিং করেছেন। শেষে সফলও হয়েছেন। এস এম সুলতান তার কর্মের বাইরেও আরও একটি জায়গায়, আহমদ ছফার যুগ উত্তীর্ণ রচনায়, আয়ুষ্মান হয়ে থাকবেন।

বরাবরের মতই আহমদ ছফা ভুল লোকের তারিফ করে সময় নষ্ট করেননি। *'বাংলার চিত্র-ঐতিহ্য : সুলতানের সাধনা'* শীর্ষক প্রবন্ধটি তিনি লিখেন ১৯৮০ সালে। তার ঠিক দু'বছর পর ১৯৮২ সালে এস এম সুলতান একুশে পদক পান। ক্রমান্বয়ে মিলতে থাকে বহু সম্মাননা।

আমি অদ্ভুত একটি মিল পেয়েছি আহমদ ছফা ও এস এম সুলতানের মাঝে। দুজনেই ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা ও বন্ধনহীন জীবনের বাসিন্দা দুজন চিরকুমার।

অনিকেত : মানবীয় সম্পর্কের নান্দনিক রূপায়ণ

জান্নাতুন নূর দিশার মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস ***'অনিকেত'*** নিয়ে লিখেছেন

ইমতিয়াজ আহমেদ

প্রথম যেকোনো কিছুর প্রতি মানুষের আলাদা মমত্ববোধ জন্মে। *'অনিকেত'* লেখকের প্রথম উপন্যাস। মানবজীবনের কিছু অনস্বীকার্য দিকের বেশ গোছানো একটি শিল্পীত রূপ দেওয়ার সর্বাত্মক এবং আন্তরিক চেষ্টা রয়েছে বইটির পাতায় পাতায়।

নারী পুরুষ সম্পর্কের দ্বন্দ্বমুখর অগ্রগতি; জীবনের অবশ্যম্ভাবী অনিশ্চয়তা, সম্পর্কের বাঁকবদল, মনস্তাত্ত্বিক চিন্তাধারা, রাজনৈতিক রূঢ় বাস্তবতাসহ সাম্প্রতিকতা স্পর্শ করা বহু কিছুই উপন্যাসে সহজভাবে বর্ণিত হয়েছে।

লেখক বা সৃজনীশক্তির মানুষ সম্ভবত খুব বেশি জিতে যান, যখন তার কোনো একটি সৃষ্টিকর্মের প্রতিটি বিষয়, খুঁটিনাটি, প্রতিটি চরিত্রের সঙ্গে পাঠক বা দর্শক একাত্ম হতে পারেন, ডুবে যেতে পারেন সৃষ্টিতে, আবিষ্কার করতে পারেন নিজেকে সেই বিষয়ে, কর্মে কিংবা চরিত্রে। পাঠক হিসেবে 'অনিকেত' এর চরিত্রগুলো আমার কাছে এমনই। উপন্যাসটির কমবেশি সব চরিত্রেই পাঠক লীন হয়ে যেতে পারবেন।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র এহসান গাজী। অনিবার্য এ খল চরিত্রে আবর্তিত হয়েই এর কাহিনি ইতিসীমা ছুঁয়েছে। প্রোটাগনিস্ট ক্যারেক্টারও বলা যায়। আর নায়কোচিত ভূমিকায় আছে চরিত্র হাসান মুরাদ। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে পেখম, ছেংখিং, ভোজপুরি, রোখসানা এবং অপ্রধান চরিত্রে রয়েছে চম্পা, নাজমুল, তৈয়ব, ফরুজে প্রমুখ।

আমাকে খুব বেশি আকৃষ্ট করেছে ছেংখিং ও মুরাদ চরিত্র। খুব বেশি দুর্দান্ত, স্পর্ধিত, সাহসী এবং বস্তুনিষ্ঠ চরিত্র উভয়ই।

বর্ণনার ভাষা প্রমিত বাংলা আর কিছু চারিত্রিক সংলাপ কথ্য বাংলায় লেখা। পাঠক সহজেই বুঝে নিতে পারবেন।

বইটির সবচাইতে সৌন্দর্যের বিষয় এর কিছু বাস্তবধর্মী চিত্তাকর্ষক উক্তি, কিছু অনুচ্ছেদ। বিশেষ করে পর্ব পনেরোর শেষ অনুচ্ছেদ, সতেরোতম পর্বের তেরো ও চৌদ্দ অনুচ্ছেদ, পর্ব একুশের শেষ অনুচ্ছেদ বেশ মর্মস্পর্শী মনে হয়েছে। *'অনিকেত'* এ জ্ঞাতব্য কিছু তথ্য আছে। যা জানলে পাঠক উপকৃত বৈ ক্ষতির সম্মুখীন হবেন না।

মুদ্রণ ত্রুটি রয়েছে কিছু। যথা - ক্ষ্যাত, ক্ষ্যাতে, চলতি ছিল, বিশ্বব্রহ্মান্ডে, বাছানার, উদ্যোমীরাই, বাঙালি অফিসের প্রেমে, করব, সম্রান্ত, আরামচেহারে, দকে, পেছনেম ইত্যাদি এবং ব্যক্তি অনুসারে ক্রিয়ার কিছু অসঙ্গত প্রয়োগ রয়েছে। মুদ্রণপ্রমাদে কিছু তথ্যের অসামঞ্জস্য দেখা গেছে, যেমন– পেখমের উচ্চতা দুই জায়গায় দুই রকম এসেছে, রুহুল এর উপাধি গাজী থেকে একবার আমীন হয়েছে।

উপন্যাসে আরও একটি চমৎকার বিষয় ছিল, লেখকেরই প্রথম প্রকাশিত কাব্য *'নির্ভরযোগ্য গোপনীয়তা'*র কিছু কবিতার চরণ এতে গৃহীত হয়েছে। এটা ভালো লেগেছে। বিশেষত লেখক *'আয়ু'* কবিতার কিছু অংশ ব্যবহার করেছেন। সচেতন পাঠক চব্বিশতম পর্বে এর নমুনা পাবেন। আর কাহিনির আন্তঃসম্পর্কীয় মোড় আঁচ করা যায় ষোলতম পর্বে এবং অনিশ্চিত অনিবার্য পরিস্থিতির শুরু পর্ব তেত্রিশে।

'অনিকেত' এর চৌত্রিশটি আকর্ষণীয় উক্তির কিছু উল্লেখ,

- কখনোই নিজের না হয়ে ওঠা মানুষটাকে হারিয়ে ফেলার ভয় যাকে পেয়ে বসে, তার চেয়ে শুদ্ধ দুঃখ আর কেউ লালন করে না পৃথিবীতে।

- চূড়ান্ত ভালো বলে পৃথিবীতে কিছু নেই।

- এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কে না পরাজিত! সকলেরই জীবনে পরাজয় আছে। দিনশেষে আমরা সকলেই কোথাও না কোথাও পরাজিত হই। হাজারো যুদ্ধজয়ী জুলিয়াস সিজার, আলেকজান্ডাররাও হয়ত ব্যক্তিজীবনে কোনো না কোনো অপ্রাপ্তি বা পরাজয় বুকে ধারণ করেই গেছেন। এক জীবনে কার সব সাধ পূরণ হয়।

- জগতসংসারে চূড়ান্ত নৈতিক মানুষেরও হুট করেই কোনো স্খলন হয়ে বসে, সে স্খলনের পক্ষে আসলে যুক্তিও দাঁড় করানো যায় না।

- অন্যায় জেনেও কখনো কখনো নিজেকে নিবৃত্ত করা যায় না। গেলে সবাই মহাত্মা হয়ে যেত। সিনেমা-নাটকে নায়ক মহাত্মা হলেও জীবনগল্পে নায়কেরও স্খলন ঘটে!

- আসলে পৃথিবীর সকল অন্যায়, ভুল এবং পাপের দায় মধ্যম ও নাম পুরুষের। উত্তম পুরুষে কখনো কোনো অন্যায় বর্ণিত হয় না, খলচরিত্র অঙ্কিত হয় না। নিজেকে অপরাধী ভাবতে পারা যায় না সহজে, সকলেই যুক্তি দিয়ে দায়মুক্তি চায়।

- প্রত্যেক শুদ্ধ কান্নার বিনিময়ে মানুষ স্রষ্টার নিকট হতে অসাধারণ কিছু দানপ্রাপ্ত হয়। কোনো কান্নাই কখনো বিফলে যায় না।

- পৃথিবীতে দুটো কারণে মানুষ স্তব্ধ হয়- প্রত্যাশার বাইরে ভালোবাসা প্রাপ্তি এবং প্রত্যাশার বাইরে ভালোবাসাহীনতা।

- পাখি আকাশ হারালে আকাশের মূল্য বোঝে, মানুষ নিরাশ্রয় হলে মূল্য বোঝে আশ্রয়ের।

যাহোক, লেখক জান্নাতুন নূর দিশার প্রথম উপন্যাস হিসেবে '*অনিকেত*' অবশ্যই প্রশংসনীয়। এটি পড়ে পাঠক হিসেবে পাঠের ক্ষুধা মিটে আমার স্বস্তির ঢেঁকুর উঠেছে সহজেই। তাছাড়া জানাতে পারি, লেখকের এযাবৎ প্রকাশিত এবং আমার পঠিত চারটি গ্রন্থের (তিনটি কাব্য, একটি উপন্যাস) মধ্যে '*অনিকেত*' বইটিই লেখকের পাঠকপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

নিখোঁজ একটি দেশ

আবদুল হাই শিকদারের ***'হারিয়ে যাওয়া হায়দারাবাদ'*** নিয়ে লিখেছেন

মাহমুদুল হাসান

কারো কোনো প্রশ্ন আছে?

ক্লাস লেকচার বা সেমিনারের শেষে বক্তারা এই কথাটা বলে থাকেন। এই পাঠ পর্যালোচনাটি শুরু করি একটি প্রশ্ন দিয়ে। বলুন তো– সেটি কোন দেশ?

ছিল একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ, যার ছিল সুবিশাল আয়তন। ছিল নিজস্ব পতাকা, নিজস্ব ভাষা, জাতীয় সংগীত, নিজস্ব মুদ্রা, সামরিক বাহিনী, গণতান্ত্রিক সরকার, আইন আদালত, শিক্ষা ব্যবস্থা আর নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়, রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিমানবন্দর, বিশ্বের দেশে দেশে রাষ্ট্রদূত, আরও ছিল জাতিসংঘসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি।

কিন্তু এখন সেসব কিছুই নেই!

নেই এমনকি ইতিহাসের পাতায়ও!

না, আমি নির্যাতিত ফিলিস্তিনের কথা বলছি না। আরও ক্লু দিচ্ছি...

১৯৪৭ সালে ঔপনিবেশিক ব্রিটেন থেকে ভারত পাকিস্তানের সাথে এই দেশটিও স্বাধীনতা লাভ করেছিলো।

দেশটির নাম এত বেশি পরিচিত যে অনেকে শুনে রীতিমতো অবাক হবেন!

যারা আইপিএল এর নিয়মিত দর্শক, আমাদের কাটার মাস্টার মুস্তাফিজ কিংবা বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসানের খেলা দেখার জন্য অধীর আগ্রহে বসে থাকেন, তাদের কাছে নামটি অতি পরিচিত।

দেশটির নাম 'হায়দারাবাদ'। ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে যাওয়া এই দেশের ইতিহাস জেনেছি কবি আবদুল হাই শিকদারের *'হারিয়ে যাওয়া হায়দারাবাদ'* নামক বই থেকে।

রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন হওয়া দেশের নাগরিক হয়েও আপনি রীতিমতো আঁতকে উঠবেন, যখন জানতে পারবেন স্বাধীনতা হারানোর আগে সে দেশটিতে কেমন পরিস্থিতি বিরাজ করছিলো!

শান্তির সুবাতাস বয়ে চলা সদ্য জন্মানো সে দেশটিতে কারা যেন অযথাই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধিয়ে দিতো। কারা যেন দেশের শান্তি শৃঙ্খলা বিনষ্ট করার প্রয়াসে কল্পিত সংখ্যালঘু নির্যাতন–নিপীড়নের কথা প্রচার করে বিদেশি সাহায্য চেয়ে বসতো। সেসব খবর অতি আগ্রহভরে প্রতিবেশী দেশের প্রচারমাধ্যম তিলকে তাল বানিয়ে করতো প্রচার।

সীমান্তে হত্যা আর দেশের অভ্যন্তরে তৈরি করা হয়েছিলো অরাজকতা, হেন কোনো কাজ নেই যা প্রতিবেশী রাষ্ট্রটি করতো না! (রাষ্ট্রটি বলার কারণ– দেশটির চারদিকে একটিই রাষ্ট্র ছিলো।)

বিপদের সময় কোনো কাজে আসেনি মহান(!) জাতিসংঘের সদস্যপদ আর তার শান্তি মিশন। গণতন্ত্রের রক্ষাকর্তা কিংবা মানবাধিকারের বুলি আওড়ানো পারমাণবিক অস্ত্রধারী রাষ্ট্রগুলো এগিয়ে আসেনি। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা আর শান্তির বাণী নিয়ে গুনগুন করা গায়েনরাও দু'লাইন লেখা বা বলার প্রয়োজনবোধ করেনি। ইতিহাসও নির্দয়ভাবে চেপে গেছে ইতিহাসের করুণ এই পরিচ্ছেদটি। মুহূর্তেই নাই হয়ে গেলো লক্ষ হৃদয়ের স্বপ্নের স্বাধীন ভূখণ্ড!

মিথ্যে হয়ে গেলো অগণিত খুন, ধর্ষণ আর স্বজন হারানো বেদনার্তের অশ্রুসিক্ত চাহনি! বিশ্ব মানচিত্র থেকে মুছে গেলো একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের নাম নিশানা।

কবি আবদুল হাই শিকদারের লেখনি যারা পড়েন, তারা জেনে থাকবেন, লেখক দেশ বিদেশ ঘুরে, নথিপত্র সংগ্রহ করে, তথ্য উপাত্ত দিয়ে তাঁর ভ্রমণকাহিনীগুলোকে সমৃদ্ধ করে থাকেন। এই বইতেও লেখক বিভিন্ন রেফারেন্স ও লজিক টেনে এনে নিজের প্রিয় মাতৃভূমি নিয়ে কিছু আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন, যা পাঠককে রীতিমতো আতঙ্কিত করে তুলবে।

দেশি বিদেশি কাব্য তুলির আঁচড় দিয়েছেন পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়, বিমোহিত করবে যে কাউকে।

বইয়ের শুরুতে লেখক যার কাছ থেকে সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সেই ৭৮ বছর বয়স্ক কুতুবউদ্দিন জানিয়েছেন মাত্র ৬ দিনের যুদ্ধে কিভাবে তিনি পিতা-মাতা আর প্রিয়তমা স্ত্রীকে হারিয়েছেন, যুদ্ধের পর থেকে আজও পর্যন্ত তাঁর মতো হাজারো হায়দারাবাদের মানুষ খুঁজে ফিরছে হারানো স্বজনকে, পিতা–মাতাকে, ভাই–বোনকে, স্ত্রী–পুত্রকে, হারানো স্বাধীনতা ও প্রিয় মাতৃভূমিকে।

মৃত্যুর নৃত্য

*কাজী নজরুল ইসলামের বিখ্যাত উপন্যাস **'মৃত্যুক্ষুধা'** নিয়ে লিখেছেন–*

নীলা

"এদের অভাব অসীম, অপরিমেয়। দুঃখ-দারিদ্র্য, রোগ-শোক, ক্ষুধা ও দূর্ভিক্ষ তাদের গ্রাস করে রাখে সর্বক্ষণ। এদের একদিকে মৃত্যু আর অন্যদিকে ক্ষুধা। মৃত্যুই যেন হয়ে উঠেছে তাদের ক্ষুধা–মৃত্যুক্ষুধা।"

পুতুল-খেলার কৃষ্ণনগর; যেন কোনো খেয়ালি–শিশুর খেলা শেষের ভাঙা খেলাঘর। উপন্যাসের যাত্রা শুরু কৃষ্ণনগরের চাঁদসড়কে। মুসলমান, কনভার্টেড ক্যাথলিক খ্রিস্টান এবং দু'চারেক হিন্দু ঘরের বাসস্থান। ক্ষুধা-যন্ত্রণার সমীকরণে অন্য সব কিছুই যেন নস্যি সেখানে। ক্ষুধার তাড়নায় কীভাবে মানুষ ধর্মান্তরিত হয়, কেমন করে মানুষ নিজের সন্তানের মৃত্যু কামনা করে, কোন পরিস্থিতিতে মৃত্যুই হয়ে উঠে তাদের ক্ষুধা... এই নির্মম বাস্তবতা ফুটে উঠেছে উপন্যাসটিতে।

কাজী নজরুলের এক অনন্য সৃষ্টি 'মেজ-বৌ' চরিত্রটি। নির্জলা মন, স্নেহপ্রবণ ও সহানুভূতিশীল। দারিদ্র্যের কাঁটাবনে মেজ-বৌ যেন এক প্রস্ফুটিত কমল। তার অর্ন্তদ্বন্দ্ব ও বর্হিদ্বন্দ্ব উপন্যাসের উৎকর্ষতা বাড়িয়ে তোলে। ক্ষুধার তাড়না ও দারিদ্র্যের নিপীড়নে পিষ্ট মেজ-বৌ ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য হয় এবং তার ছেলে মেয়েদের ক্ষুধা মেটাতে মিশনারীতে যায়। পরবর্তীতে ঘটনার আবর্তে মেজ-বৌ ফিরে আসে বস্তি জীবনে।

উপন্যাসের মূল উপকরণ দারিদ্র্য–যাতনা ও ক্ষুধা হলেও এতে রয়েছে রোমান্টিকতার ছোঁয়া। পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক সংকট ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহারের দিকটিও ফুটে উঠে দ্বিতীয় অংশের রুবি–আনসারের কাহিনীর মধ্য দিয়ে।

সমাজকর্মী, দেশকর্মী, আত্মত্যাগী ও সংসারত্যাগী আনসার এবং জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের তরুণী কন্যা রুবি শৈশবে একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট থাকলেও রুবির অমতে তাকে অন্যত্র বিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তাদের সংসার টিকেনি। পরবর্তীতে আনসারের অসুস্থতার খবরে রুবি বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে তাকে সুস্থ করার উদ্দেশ্যে ওয়ালটেয়ারে যায়। অক্লান্ত পরিশ্রম করেও শেষ পর্যন্ত আনসারকে বাঁচানো যায় না এবং তাকে সেবা যত্নের ফলে একই ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে রুবি মারা যায়। তাদের ভালোবাসা ও ত্যাগ

উপন্যাসের সমাপ্তিকে আবেগঘন করে তোলে। পাঠক–হৃদয়ে বাজতে থাকে একটি করুণ সুর।

খ্রিস্টান মিশনারী এবং মুসলিম অধ্যুষিত এলাকার ধর্মীয় মতভেদ, আর্থিক টানাপোড়েন, সম্পর্কের অর্ন্তদ্বন্দ্ব সব মিলিয়ে মানবিক চৈতন্যের বিদগ্ধ রচনাশৈলী ফুটে উঠেছে মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসে। তৎকালীন সমাজের মানুষের দুঃখ–দুর্দশা এবং তা লাঘবের জন্য আনসারের মতো মানুষের ত্যাগের বিষয়টিও ফুটে উঠেছে উপন্যাসে। নজরুলের উপন্যাসগুলোর মধ্যে শিল্পাঙ্গিক ও জীবনবোধের সফলতায় *'মৃত্যুক্ষুধা'* অন্যতম।

জ্ঞানবৃদ্ধের মুখে শুনি অতীতের বয়ান

আবুল মনসুর আহমেদের রাজনৈতিক আত্মজীবনী ***'আমার দেখা রাজনীতির ৫০ বছর'*** গ্রন্থ নিয়ে লিখেছেন–

মাজহারুল ইসলাম সাইমন

প্র্যাক্টিক্যাল-থিওরেটিকাল রাজনীতির জন্য এ বই দরকারী। দেশের ইতিহাস, দ্বিজাতিতত্ত্ব, পাকিস্তানের উত্থান-পতন, রাজনীতিবিদদের প্রশংসা-সমালোচনা, কী হলে কী হতে পারতো ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াতো এমন অনেক বিষয় উঠে এসেছে এ বইতে।

সমস্যা শুধু একটাই, বইটি ৬৫৬ পৃষ্ঠার। তাও আবার রাজনীতি নিয়ে; প্রচুর ধৈর্য না থাকলে বইটি শেষ করা কঠিন। কিন্তু একবার শেষ করতে পারলে বুঝবেন আপনার মস্তিষ্ককে ভালো কিছু খোরাক দিয়েছেন।

বইয়ের বিশেষত্ব লেখক নিজেই। অংশগ্রহণমূলক অভিজ্ঞতা নির্ভর বই যেহেতু, লেখক সম্পর্কে একটু করে বলতে হয়। লেখক ছিলেন পাক্কা একজন পলিটিশিয়ান। শেখ মুজিব উনাকে ডাকতেন 'লিডার' বলে। বিভিন্ন সময়ে উনার কাছে গিয়ে পরামর্শও নিতেন। পূর্বপাকিস্তানের বাণিজ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর অবর্তমানে দেশভাগের পর লেখক ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন।

বইয়ের নামে *'৫০ বছর'* উল্লেখ থাকলেও ৫০ বছরেরও অধিক সময়ের বয়ান রয়েছে এখানে। ১৯২০-১৯৭৩ পর্যন্ত নিজের দেখা গুরুত্বপূর্ণ সব ঘটনা আত্মজীবনী আকারে লিখেছেন আবুল মনসুর আহমেদ। তাই বইটিকে রাজনৈতিক আত্মজীবনী বললেও অত্যুক্তি হবে না।

ছোটবেলায় অন্যায় দেখে প্রতিবাদী হয়ে উঠতেন, ছিলেন একরোখা–জেদি, যা তাঁর রাজনীতিবিদ হয়ে উঠতে সাহায্য করে। চিন্তা-ভাবনায় ছিলো স্বজাতি–প্রীতির ছাপ, সেসবও উঠে এসছে বইয়ের ছত্রে ছত্রে।

লেখাপড়া শেষে সাংবাদিক হিসেবে কাজ করতেন, ওকালতি করছেন, রাজনীতিতে এসে কৃষক-প্রজা পার্টির সহ-সভাপতি ছিলেন। পরে রাজনীতি করেছেন ভারতীয় কংগ্রেসের ব্যানারে এবং তারও পরে দেশ ভাগ হয়ে গেলে মুসলিম লীগের হয়ে। রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের এমন বৈচিত্র্য তার অভিজ্ঞতাকে করেছে দারুণ সমৃদ্ধ–শাণিত।

মহাত্মা গান্ধী, কায়েদে আজম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ, নেতাজী সুভাষ, জওহরলাল নেহেরু, শেরেবাংলা এ.কে. ফজলুল হক, খাজা নাজিমুদ্দিন, মওলানা ভাসানীসহ ভারত-পাকিস্তানের অনেক ঝানু পলিটিশিয়ানের সাথে ছিল তাঁর হৃদ্যতার সম্পর্ক।

নেতাজীর সাথে ছিলেন 'তুমি' সম্পর্কের। নেতাজী অন্তর্ধানের আগে কায়েদে আজমের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন; আর যাওয়ার আগে আবুল মনসুর নেতাজীকে কিছু পরামর্শও দিয়েছিলেন যা নেতাজী গুরুত্বের সাথে মেনে নিয়েছেন। এমন প্রবীণ একজন মানুষের লিখিত বইয়ের আলাদা ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে।

আমরা অনেকে দ্বিজাতিতত্ত্বকে ঠিকভাবে দেখি, আবার অনেকে ভ্রান্ত আখ্যা দিই। আসলে এটি একটি আপেক্ষিক বিষয়। এক কথায় এ ব্যাপারে মন্তব্য করা বা সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া মূর্খতা বই কিছু নয়। দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ কলকাতায় হিন্দু–মুসলিমদের দাঙ্গাকে লেখক বড় করে দেখেছেন। দেশ বিভাজন না হওয়ার জন্য অনেক পলিটিশিয়ানই চেষ্টা তদবির করেছেন ; কিন্তু জনগণ মেনে না নিলে আর কিইবা করার থাকে। সীমানাগত বিভাজন হওয়ার পর জনসংখ্যাগত বিভাজন কিভাবে সম্পন্ন হলো সেসবের বর্ণনা জীবন্ত হয়ে উঠে এসছে বইটিতে।

পূর্ব পাকিস্তানের বাণিজ্যমন্ত্রী থাকাকালীন নেহেরুর সাথে প্লেনে দীর্ঘক্ষণের আড্ডা হয় লেখকের। নেহেরু মন থেকে ভারত–পাকিস্তানের সীমানাগত বিরোধের সমাধান চাইলেও অনেকেই তা চাইতো না। এই বিরোধের পরিণতিতে বাজে কিছু ঘটতে পারে বলে লেখক নেহেরুর কাছে আশংকা ব্যক্ত করেছিলেন। ফলশ্রুতিতে '৬৫তে ঘটে গেলো কাশ্মীর নিয়ে যুদ্ধ, সম্পর্ক এত বাজে দিকে গড়ালো যে আর ভালো হলো না। লেখক এক্ষেত্রে দক্ষ রাজনৈতিক বিশ্লেষকের মতো দেখিয়েছেন 'কী হলে কী হতে পারতো'।

মন্ত্রী থাকাকালীন আবুল মনসুর আহমেদ যা যা প্রতিবন্ধকতা দেখেছেন তাই লিখেছেন অকপটে। রাষ্ট্রপতির অদূরদর্শীতা ও নিজের অস্ত্রে নিজেই ঘায়েল হলে আইয়ুব খান মার্শাল ল' জারি করেন, লেখক মন্ত্রিত্ব হারান।

শেখ মুজিবের মুজিব হয়ে উঠার গল্পও বিবৃত হয়েছে এই গ্রন্থে। লেখক উনার প্রশংসা যেমন করেছেন, সমালোচনা করতেও বিন্দুমাত্র ছাড় দেননি; এই সময়ে যেটার খুব অভাব।

ছাত্র সমাজের ব্যাপক চাপ থাকা সত্ত্বেও ৭ই মার্চ ভাষণে স্বাধীনতার ঘোষণা না দেওয়া, উনার পাহাড়সম ব্যক্তিত্ব, রাজনৈতিক প্রশংসা করেছেন। সমালোচনা করেছেন পাকিস্তানিরা তাকে পাকিস্তানে যাওয়ার প্রস্তাব দিলে তিনি তা গ্রহণ করেননি, ব্যস্ততার কথা বলে পাশ কাটিয়েছেন। লেখক দেখিয়েছেন– মুজিব যদি দাওয়াত গ্রহণ করে পাকিস্তানে যেতেন তাহলে উনার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব আর বাগ্মিতায়

পাকিস্তানি জনগণ মুগ্ধ হতো। ফলে ৬ দফা নিয়ে তাদেরকে যেভাবে মাইন্ড ওয়াশ করা হয়েছিলো তা দূর হতো, আর সংকট কেটে যেতো অনেকটাই।

একটা খটকা লাগার বিষয় হলো, মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকার মতো একটা জায়গায় পরিবার নিয়ে উনি এতটা সেইফ ছিলেন কিভাবে, এটা উনি বইতে ক্লিয়ার করেননি।

স্বাধীনতার মাত্র ৩ মাসে বাংলাদেশের সংবিধান তৈরির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন লেখক, যেখানে পাকিস্তান হওয়ার পর সংবিধান তৈরি করতে তাদের লেগেছে ৮ বছর! সমালোচনা করেছেন সংবিধানের মূলনীতির। সংবিধানের ভাষাগত ত্রুটিগুলো দেখিয়েছেন। ডেমোক্রেসি, সোশ্যালিজম, ন্যাশনালিজম, সেক্যুলারিজমকে মূলনীতি হিসেবে তাঁর পছন্দ হয়নি। তিনি এর গঠনমূলক সমালোচনা করেছেন। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের পার্লামেন্টে শক্ত কোনো অপজিশন পার্টি না থাকা, অপজিশন পার্টির লিডার হিসেবে আতাউর রহমানকে অস্বীকৃতি জানানোর জন্য আওয়ামি লীগের বিরোধিতা করেছেন।

পরিশেষে নতুন নেতৃত্ব আর বাংলাদেশের প্রতি শুভকামনা জানিয়ে লেখক ঢাউস এই বইটির সমাপ্তি টানেন। উপমহাদেশের রাজনৈতিক ঘটনা চক্রের প্রত্যক্ষদর্শী ঐতিহাসিক এই বাঙালি জ্ঞানবৃদ্ধের অকপট বয়ান সমৃদ্ধ বইটি পাঠকের বোধের জায়গায় নিশ্চিত নাড়া দিবে।

মুজিব থেকে বঙ্গবন্ধু

শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা ***'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'*** নিয়ে লিখেছেন–

সুমাইয়া মোস্তারী

শেখ মুজিব থেকে বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠার গল্প *'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'*। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা ২০০৭ সালে কারাবন্দী অবস্থায় বইয়ের ভূমিকা লেখেন এবং মুক্তি পেয়ে বইটি প্রকাশনার পদক্ষেপ নেন। বঙ্গবন্ধু ১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে রাজবন্দি থাকা অবস্থায় বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী ও সহধর্মিণীর অনুরোধে আত্মজীবনী লেখা শুরু করেন। বইটিতে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত ঘটনাবলির উল্লেখ রয়েছে। জীবনের বেশিরভাগ সময় কারাগারের নির্জন প্রকোষ্ঠে কাটলেও সবসময় দেশ ও দেশের মানুষকে নিয়ে চিন্তা করেছেন। তিনি মানুষকে মানুষ হিসেবেই দেখেছেন এবং সারাজীবন অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে লালন করেছেন। নিজ বংশপরিচয়, শৈশবের স্মৃতি, ছাত্রজীবন, রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন অধ্যায় ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ বর্ণনা রয়েছে বইটিতে।

তাঁর রাজনীতিতে প্রবেশ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর হাত ধরে; যাকে তিনি তাঁর 'রাজনৈতিক গুরু' হিসেবে অভিহিত করেছেন। ১৯৩৮ সালে গোপালগঞ্জে এক জনসভায় শেরে বাংলা ও সোহরাওয়ার্দী যোগদান করেন, সেখানেই শহীদ সাহেবের সাথে কিশোর মুজিবের পরিচয়। তাঁর সূত্র ধরেই পরবর্তীতে মুজিব ছাত্ররাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন এবং মুসলিম ছাত্রলীগ ও মুসলিম লীগে যোগদান করেন।

কিশোর বয়স থেকেই তাঁর চরিত্রের মধ্যে দৃঢ়তা, প্রতিবাদী মনোভাব ফুটে উঠেছিল। পুরো রচনাজুড়ে শহীদ সাহেবের প্রতি মুজিবের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। গুরুর প্রতি শিষ্যের এই ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিঃসন্দেহে শিষ্যকে পাঠককুলের নিকট আরো মহান করে তোলে।

পাকিস্তান আন্দোলনে একজন একনিষ্ঠ কর্মীর ভূমিকা পালন করেন মুজিব। ১৯৫২ এর ২১শে ফেব্রুয়ারিতে ছাত্রজনতার মিছিলে গুলির খবর পেয়েছিলেন জেলে থাকা অবস্থায়, বিনাবিচারে বছরের পর বছর জেলে আটকে রাখার প্রতিবাদে লেখক ঐ সময় অনশন ধর্মঘট পালন করছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার স্বীকৃতি আদায়ের ক্ষেত্রে তাঁর ছিলো সংগ্রামী ভূমিকা। ১৯৪৯ এর দুর্ভিক্ষ, বাংলার হিন্দু–মুসলিম দাঙ্গা, একমাত্র বিরোধী দল হিসেবে আওয়ামী লীগ গঠন, ৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন প্রভৃতি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও তিনি আত্মজীবনীতে চমৎকারভাবে তুলে

ধরেছেন। মওলানা ভাসানী ও শেরে বাংলার সাথে মুজিবের সম্পর্ক এবং তাঁদের রাজনৈতিক নীতি-আদর্শের পরিচয় পাওয়া যায় বইটিতে। এছাড়াও চীন, ভারত, পশ্চিম পাকিস্তান ভ্রমণের বিবরণ স্থান পেয়েছে বইটিতে। যা পাঠককে উক্ত দেশসমূহের তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি বুঝতে সহায়তা করে।

কারাজীবনের দুঃসহ স্মৃতির হৃদয়স্পর্শী বর্ণনার পাশাপাশি পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও সকল সুখ দুঃখের অবিচল সাথী প্রিয় সহধর্মিণীর কথাও বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে তাঁর লেখাতে। লেখকের উপলব্ধি হলো, *"যে ছেলেমেয়েরা তাদের বাবা মায়ের স্নেহ থেকে বঞ্চিত তাদের মত হতভাগা দুনিয়াতে আর কেউ নাই।"*

বঙ্গবন্ধুর নিজ হাতে লেখা জীবনী অসমাপ্ত রয়ে গেছে বলে বইটি শেষ করার পরেও এক ধরনের আক্ষেপ থেকে যায়। তবে ১৯৫৫-৭৫ সাল পর্যন্ত তাঁর জীবনের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত সংযোজন নিঃসন্দেহে বইটিকে এনে দিয়েছে বিশেষ মাত্রা। সহজ-সরল ও সাবলীল ভাষায় লেখা বইটি বাঙালি জাতির ইতিহাসের এক অমূল্য সম্পদ। ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করা দুরন্ত এক কিশোরের জাতির পিতা হয়ে উঠার গল্পটিই আমরা বইটি পড়ে জানতে পারি। ব্যক্তি হিসেবে বঙ্গবন্ধু কেমন ছিলেন, তাঁর রাজনৈতিক জীবনদর্শন ও সত্য ইতিহাস উদঘাটনে বইটি পড়ার বিকল্প নেই। আখেরে লেখকের সুন্দর উক্তিটি দিয়ে শেষ করছি–

"একজন মানুষ হিসাবে সমগ্র মানবজাতি নিয়েই আমি ভাবি। একজন বাঙালি হিসাবে যা কিছু বাঙালিদের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এই নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাসা, যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে।"

লেখা আহ্বান

প্রিয় পাঠক

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে প্রেক্ষার পঞ্চম সংখ্যা।
যে কোন বইয়ের পাঠ–পর্যালোচনা লিখে পাঠাতে পারবেন এই সংখ্যায়। তাই নিজের পঠিত পছন্দের বই নিয়ে ঝটপট লিখে ফেলুন চমৎকার একটি ***'পাঠ–পর্যালোচনা'***। লেখাটি ৪০০ থেকে ৮০০ শব্দের এবং বিজয় SutonnyMJ ফন্টের হলে ভালো হয়।

১০ জুলাই, ২০২১ তারিখ পর্যন্ত লেখা পাঠানো যাবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা:

cuabrittimancho2000@gmail.com

যেকোনো প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চের **facebook page**–এ।

[প্রচলিত অর্থে ***'বুক রিভিউ'*** বলতে যা বুঝায় আমাদের ***'পাঠ–পর্যালোচনা'*** তা নয়। বুক রিভিউতে বইয়ের আকর্ষণীয় কিছু অংশ তুলে ধরে বইটি পাঠে উদ্বুদ্ধ করা হয়। প্রকাশকগণ বইয়ের কাটতি বাড়ানোর জন্যেও এরকম *'রিভিউ কন্টেন্ট'* তৈয়ার করে থাকেন।

আমরা পাঠ–পর্যালোচনা পরিভাষাটিকে আরেকটু ওজনদার মনে করি। পাঠ–পর্যালোচনায় পাঠক নির্দিষ্ট কোন বইয়ের ব্যাপারে নিজের ভালোলাগা-মন্দলাগা ব্যক্ত করবেন। এই ভালো–মন্দের পরিসরে ইতিহাস, রাজনীতি, ধর্ম, মূল্যবোধ, সাহিত্যরুচি ইত্যাদির সবক'টিই বিরাজমান থাকবে। পর্যালোচনার প্রয়োজনে পাঠ–পর্যালোচনায় বইয়ের সমাপ্তি বা মূল চরিত্রের পরিণতিও জরুর আসতে পারে; প্রচলিত বুক রিভিউতে যা দূষণীয় বলে বিবেচিত হয়। - ***মাসুম বিল্লাহ আরিফ, সম্পাদক***]

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চ